এলডিসি, উন্নয়নশীল এবং মধ্যম আয়ের ধারণা: বিভ্রান্তি ও ব্যাখ্যা

জাকির হোসেন | প্রকাশ : ২৩ মার্চ ২০১৮ | আপডেট : ২৮ মার্চ ২০১৮

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) শ্রেণি থেকে বের হবার যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপনের শোভাযাত্রায় সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্থা তাদের ব্যানারে লিখেছে, বাংলাদেশ নিম্ন আয় থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কোনো কোনো সংস্থার ব্যানারে লেখা হয়েছে, বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। দুটি ক্ষেত্রেই ধারণাগত বিভ্রান্তি রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি নীতিনির্ধারকদের বক্তব্যেও এ নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে।

নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব উন্নতি করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে আর্ন্তজাতিকভাবে বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করছে বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) গুলো অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যও আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত। ধারাবাহিক অগ্রগতির কারণে আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোর দেশভিত্তিক শ্রেণিকরণে বাংলাদেশ ওপরের দিকে উঠছে। বাংলাদেশের অর্জনকে খাটো করে দেখা কোনোভাবেই এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। মাথাপিছু আয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোর শ্রেণিকরণ নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা এ লেখার উপজীব্য।

বাংলাদেশ ২০১৫ সালের ১ জুলাই নিম্ন -আয় থেকে নিম্ন -মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। শুধু মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক চার শ্রেণিতে দেশগুলোকে শ্রেণিকরণ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিচের শ্রেণি নিম্ন-আয়। এর পরে যথাক্রমে নিম্ন-মধ্যম, উচ্চ-মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের দেশ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পৌছে গেছে। অথচ বিভিন্ন সরকারি ভাষ্যে বলা হচ্ছে— বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে চায়। এক্ষেত্রে 'মধ্যম' বলতে যদি 'উচ্চ-মধ্যম' বোঝানো হয়ে থাকে, তাও পরিষ্কার করা হচ্ছে না। যদিও এ সময়ের মধ্যে ওই স্তরে যাওয়া সম্ভব নয়।

আমরা জানি, সরকারের রুপকল্প-২০২১ অনুযায়ী, ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পৌছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশের এ অর্জন আগেই হয়েছে, যার অন্যতম কারণ জিডিপি গণনার ভিত্তিবছর পরিবর্তন। ২০১৩ সালে জিডিপির ভিত্তিবছর ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর নির্ধারণ করা হয়। মাথাপিছু আয় প্রতিবছরই বাড়ছে। তবে ভিত্তিবছর হালনাগাদ করায় মাথাপিছু আয়ের অংক আরও বেড়েছে।

২০১৫ সালে নিম্ন-আয় থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত সীমা ছিল, মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১ হাজার ৪৬ ডলার। বিশ্বব্যাংকের অ্যাটলাস পদ্ধতিতে হিসাব করা মাথাপিছু আয় আমাদের পরিসংখ্যান ব্যুরোর চেয়ে কম থাকে। যাই হোক, ওই বছর উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য ন্যূনতম মাথাপিছু আয় ধরা হয় ৪ হাজার ১২৬ ডলার। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমাদের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬০৫ ডলার। আর বিশ্বব্যাংকের অ্যাটলাস পদ্ধতিতে ১ হাজার ৪৯৬ ডলার। ২০২১ সালে নিশ্চয় উচ্চ-মধ্যম আয়ের যোগ্যতা নির্ধারণে মাথাপিছু আয়ের সীমা ২০১৫ সালের চেয়ে বাড়বে। যদি নাও বাড়ে, তাতেও প্রায় তিনগুণ আয় বাড়তে হবে, যা তিন বছরের মধ্যে অসম্ভব।

এবার আসি এলডিসি থেকে উত্তরণের কথায়। জাতিসংঘ নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড অনুযায়ী বিভিন্ন দেশকে এলডিসি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করে। প্রতি তিন বছর পর প্রত্যেকটি এলডিসিগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করে জাতিসংঘের একটি কমিটি। এলডিসি থেকে উত্তরণেরও মানদণ্ড রয়েছে। এলডিসি থেকে বের হলে সেই দেশ উন্নয়নশীল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উন্নয়ন নীতি বিষয়ক কমিটি (সিডিপি) কয়েকদিন আগে তাদের ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বলেছে, বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার মানদণ্ড প্রথমবার পূরণ করেছে। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা - এই তিন সূচকেই নির্ধারিত মানদণ্ড অতিক্রম করেছে। আশা করা যায়, ২০২১ সালে ওই কমিটির পর্যালোচনায় বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো যোগ্য বিবেচিত হবে। তখন বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের সুপারিশ করা হবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে। কিছু প্রক্রিয়া শেষে বাংলাদেশ ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে বের হয়ে আসবে। এরপর আরও তিন বছর অর্থাৎ ২০২৭ সাল পর্যন্ত এলডিসি হিসেবে বাণিজ্য ও ঋণসুবিধা পাবে বাংলাদেশ। সুতরাং, বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হয়েছে বলে কারও কারও যে ধারণা রয়েছে, তা সঠিক নয়।

নিম্ন মাত্রার আর্থ-সামিাজিক উন্নয়ন, নিম্ন উৎপাদশীলতা ও বিনিয়োগ, সুশাসনের অভাব, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এমন দেশগুলোকে ১৯৭১ সাল থেকে এলডিসি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা শুরু করে জাতিসংঘ। ১৯৭১ সালে এলডিসি ছিল ২৫ টি। বাংলাদেশ এলডিসি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে।

এ পর্যন্ত ৫২টি দেশ এলডিসি হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। পাঁচটি দেশ এলডিসি থেকে বের হয়েছে। ১৯৯৪ সালে আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানা এলডিসি থেকে বের হয়। ২০০৭ সালে আফ্রিকার কাবো ভারদে, ২০১৪ সালে সামোয়া এবং ২০১৭ সালে ইকুয়েটোরাল গিনির উত্তরণ ঘটে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ মালদ্বীপ ২০১১ সালে

এলডিসি থেকে বের হয়। বাংলাদেশের উত্তরণ হবে সমসায়মিক উন্নয়ন ইতিহাসের একটি বড় সাফল্য। আগের যে ৫ টি দেশ এলডিসি থেকে বের হয়েছে তাদের অর্থনীতি অনেক ছোট। জনসংখ্যার আকারও কম।

লেখক: সাংবাদিক

কোথায় যাচ্ছে এত ঋণ?

জাকির হোসেন | প্রকাশ : ২৪ জানুয়ারি ২০১৮ | আপডেট : ২৪ জানুয়ারি ২০১৮

বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন) মুদ্রানীতি ঘোষণা করবে কয়েক দিনের মধ্যে। মুদ্রানীতি ঘোষণার আগেই ঋণ-আমানত অনুপাত নিয়ে বিতর্ক চলছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়ে দেয়, ঋণ-আমানত অনুপাত বা এডিআর কমানো হবে। মুদ্রানীতিতে এ বিষয়ে ঘোষণা থাকবে বলে আভাস দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর পরপরই শেয়ারবাজারে ধারাবাহিক পতন দেখা যায় এবং তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তকে দায়ী করেন অনেকেই।

বর্তমানে প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলো আমানতের ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে। আর ইসলামী শরিয়া ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকগুলো দিতে পারে ৯০ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক এ অনুপাত যথাক্রমে ৮০ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ৮৮ শতাংশ করতে চায় বলে ব্যাংকগুলোকে জানিয়েছে। ব্যাংকগুলো অবশ্য ঋণের লাগাম টেনে না ধরতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ইতিমধ্যে লিখিতভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন এবিবি বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়ে বলেছে, এডিআর কমানো হলে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা তহবিল সংকটে পড়বেন। ব্যাংক খাতে অতিরিক্ত ২০ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকার আমানতের প্রয়োজন হবে।

এক বছর আগেও আমরা জানতাম, ব্যাংক খাতে প্রচুর অতিরিক্ত তারল্য পড়ে আছে। এর মধ্যে ঋণযোগ্য তহবিলও ছিল বড় অংকের। কিন্তু গত কয়েক মাসে আমানতের তুলনায় ঋণের প্রবৃদ্ধি অনেক বেড়ে গেছে। আমানত প্রবৃদ্ধি কমার কারণ হলো, এর সুদহার অনেক কমে গেছে। মেয়াদি আমানতের সুদহার অনেক ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির নিচে চলে এসেছে। এখন বড়জোর ৫ থেকে ৭ শতাংশ সুদ পাওয়া যাচ্ছে আমানতে। ঋণের সুদহারও কমেছে। তবে ঋণের এত প্রবৃদ্ধিকে শুধু সুদহার কমে যাওয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত নভেম্বর শেষে বেসরকারি খাতে বার্ষিক ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। ডিসেম্বরের হিসাব এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে জানা গেছে, প্রবৃদ্ধি ১৮ শতাংশের বেশি রয়েছে। আগের মুদ্রানীতিতে ডিসেম্বর নাগাদ বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ১৬ দশমিক ২ শতাংশে রাখার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। বোঝাই যাচ্ছে, মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ঋণ প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। এত ঋণ কোথায় যাচ্ছে সে প্রশ্ন উঠছে। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ চাঙ্গা হয়েছে মানে বিনিয়োগ চাঙ্গা হয়েছে-তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা বিশেষত ব্যবসায়ী নেতাদের কাছে আমরা যখন রিপোর্টের জন্য মন্তব্য জানতে চাই তখন বেশিরভাগই কিন্তু এমনটাই বলেন যে, বিনিয়োগে গতি নেই । বিশেষত নির্বাচনী বছরে বিনিয়োগকারীরা একটু 'ওয়েট অ্যান্ড সি' পলিসি নিয়ে থাকেন।

আমরা জানি, ২০১০ সালের শেষে শেয়ারবাজারে ধস নামার আগের দু-একটি বছরে প্রচুর ঋণের অপব্যবহার হয়েছে। শিল্প-কারখানার জন্য ঋণ নিয়ে অনেকে তখন শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেন। আবার জমি কেনায়ও শিল্পঋণ ব্যবহার করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু এখন শেয়ারবাজারের যে অবস্থা তাতে আগের মতোই ঘটছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য উপাত্তে দেখা যাচ্ছে, আমদানি অর্থায়ন বেড়েছে ব্যাপকভাবে এবং সেখানে ঋণের প্রবৃদ্ধিটা অনেক বেশি। এখানে আরেকটি প্রশ্ন এসে যায়, যা আমদানি হচ্ছে তা কতটুকু শিল্পের কাঁচামাল, মূলধন যন্ত্রপাতি এবং মধ্যবর্তী পণ্য- তা যাচাই করা দরকার। ঋণের সুদহার কমেছে বলে বেশি বেশি বিলাসপণ্য আমদানি হচ্ছে কি না তাও খতিয়ে দেখা দরকার। আরেকটি বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। মূলধনী যন্ত্রপাতির নামে অন্য কিছু এনে কেউ কর ফাঁকি দিচ্ছে কিনা কিংবা মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে টাকা পাচার করছে কিনা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। গবেষণা সংস্থা সিপিডি দেশের অর্থনীতির ওপর সর্বশেষ পর্যালোচনায় তুলা আমদানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়াকে সন্দেহজনক বলেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে পোশাকের কাঁচামাল তুলা আমদানিতে ৭০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। অথচ এ সময়ে তৈরি পোশাক রফতানি বেড়েছে মাত্র ৭ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশের কয়েকটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে উধাও চট্টগ্রামের এক শিপব্রেকার্স ব্যবসায়ীর স্ত্রী বিদেশ থেকে নতুন প্রজন্মের একটি ব্যাংকের

শেয়ার কিনে উদ্যোক্তা হয়েছেন। ঋণের টাকা বিদেশে পাচার হওয়ার এমন ঘটনা নতুন নয়। সুতরাং মূল্যস্ফীতি কমাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমানোর প্রয়োজন যেমন আছে তেমনি ঋণের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। শুধু লাগাম টেনে ধরার বার্তা দিলে মনস্তাত্ত্বিক কারণে ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণে অধিকতর কড়াকড়ি আরোপ করতে পারে, যা বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

লেখক: সাংবাদিক